উঁচুতে এবং যেখানে জল অপ্রতুল এমন জায়গায় ভূতল থেকে সামান্য নিচে নার্সারী-বেডগুলি তৈরী করা প্রয়োজন। জমিকে গভীরভাবে খনন করে এবং নুড়ি-পাথর ও আগাছা ইত্যাদি অপসারণ করে বেডগুলি তৈরী করতে হবে। জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি ১০ টন হারে গোবরখাদ বা কেঁচোসার ভালো করে অতি অবশ্যই মেশাতে হবে। চারিদিকে ২৫ সেন্টিমিটারের আল দিয়ে ঘেরা ৩ মিটার X ১.২ মিটার পরিমাপের জমি বেড তৈরীর জন্য উপযুক্ত। উই প্রবণ অঞ্চলে বেড তৈরী করার সময় মাটিকে ০.১% ক্লোরোপাইরিফস দিয়ে নিষিক্ত করতে হবে।

কাটিং তৈরীর প্রস্তুতি: ৮-১০ মাসের পরিণত এবং ১৫-২০ মিলিমিটার ব্যাসের রোপণ উপকরণ নার্সারীর জন্য সবচেয়ে আদর্শ মানা হয়। কাটিংগুলি ৩-৪টি সক্রিয় কুঁড়িযুক্ত এবং প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা হওয়া উচিৎ। ক্ষতিগ্রস্ত ছাল-বর্জিত এবং আড়াআড়ি ভাবে কাটা তাজা কাটিং এর ব্যবহারই কাম্য।

কাটিং রোপণের পদ্ধতি: ছত্রাক সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে রোপণের ঠিক আগে তাজা কাটিংগুলি ০.২% কার্বেন্ডাজিম (ব্যাভিস্টিন) এর জলীয় দ্রবণে ১০-১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। কাটিংগুলি ভেজা জমি বা বেডে একটু হেলিয়ে লাগাতে হবে যাতে সক্রিয় কুঁড়িগুলি মাটির উপরে থাকে। ২০ সেন্টিমিটার ব্যবধানের সারিতে কাটিংগুলি এমনভাবে রোপণ করতে হবে যাতে ২টি কাটিং এর মধ্যে মোটামুটি ১০ সেন্টিমিটারের মত দূরত্ব বজায় থাকে। একটি আদর্শ পরিমাপের বেডে প্রায় ১৫০টি কাটিং লাগানো যায় অর্থাৎ এক একর জমিতে মোটামুটি ১০৬৫ সংখ্যক বেডে প্রায় ১.৬ লক্ষ কাটিং রোপণ করা যায়।

নার্সারীর সংরক্ষণ: নতুন নার্সারীর জন্য সাপ্তাহিক সেচের সুপারিশ করা হয়ে থাকে। যদিও ২ মাস পর থেকে ১৫ দিন অন্তরও সেচ দেওয়া যেতে পারে। ৩০-৪০ দিনের মধ্যে একবার এবং ৬০-৭০ দিনের মধ্যে আরও একবার অর্থাৎ মোট দুইবার জমির আগাছা পরিস্কার করা প্রয়োজন। রোপণের ৬০ দিন বাদে প্রতি বেডে ৫০০ গ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট অথবা ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করলে কাটিং এর বৃদ্ধি দ্রুততর হয়।

কাটিং এর উৎপাটন ও পরিবহন পদ্ধতি: সাধারণভাবে পর্যাপ্ত সেচযুক্ত বেডের থেকে ১১০-১১৫ দিনের পুরোনো কাটিং যা মোটামুটি ২ ফুট লম্বা চারায় পরিণত হয়, তা উৎপাটনের জন্য আদর্শ। অকারনে উৎপাটিত চারাগুলির পরিবহন করার জন্য বিলম্ব না করার জন্য সুপারিশ করা হয়ে থাকে। পরিবহনজনিত কোনো বিশেষ অসুবিধার ক্ষেত্রে উৎপাটিত চারাগুলির কাটা অংশে মোম দিয়ে সীল করে ও ভেজা চটের বস্তায় মুড়িয়ে ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে পরিবহন করা যেতে পারে।

একর প্রতি আর্থিক আয়-ব্যয়ের হিসাব: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণভাবে প্রতিটি চারা উৎপাদনের ব্যয় ১ থেকে ১.৩৫ টাকা এবং বিক্রয়মূল্য ১.৫০ থেকে ২ টাকা পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ কিষাণ নার্সারীর মাধ্যমে ১ টাকা লাভে বিক্রীত চারা থেকে ৪ থেকে ৬ মাসে লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করা যেতে পারে।

রিতা ব্যানার্জী, কে. সুরেশ, পরিতোষ কুমার ঘোষ এবং দেবাশিষ চক্রবর্ত্তী

সংস্থার ৭৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

(১৫ই অক্টোবর, ২০১৬)

কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বহরমপুর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৫/১০/২০১৬ তারিখে সংস্থার অধিকর্তা ড. কণিকা ত্রিবেদীর নেতৃত্বে পালন করেছে তার ৭৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন যথাক্রমে ড. গুরুদাস গুপ্ত, অধিকর্তা, ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, মুর্শিদাবাদ এবং ড. অভিজিত বিশ্বাস, প্রভারী অধ্যক্ষ, গভর্ণমেন্ট কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যান্ড টেক্সটাইল টেকনোলজি, বহরমপুর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ ইতিহাস সমৃদ্ধ একটি ইস্তাহার বিতরণ করা হয় যা একটি অনন্য দলিল হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। এই উপলক্ষ্যে রেশম প্রযুক্তি-বিষয়ক একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল যা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এছাড়া বহরমপুরস্থিত সমস্ত স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে রেশম-বিষয়ক ও বয়স-ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল যা অনুষ্ঠান শেষে সফল ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

পত্রিকার সকল শুভানুধ্যায়ী পাঠক-পাঠিকা, রেশম চাষীভাই ও বোনেদের কাছে আবেদন যে আপনারা 'রেশম কৃষি বার্তা'র সদস্য হোন এবং আপনাদের সুচিন্তিত মতামত জানান। আপনার রেশম চাষ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা প্রকাশনার জন্য এই ঠিকানায় লিখুন:

নির্দেশক,
কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড,
বহরমপুর – 742101, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।
ইমেল আই.ডি.: reshamkrishibarta2016@gmail.com / csrtiber@gmail.com
ফ্যাক্স : +91 3482 251233 দূরাভাষ : (03482) 253962/63/64

সদস্য চাঁদার হার: প্রতি সংস্করণ ১০ টাকা / ত্রি-বার্ষিক সদস্যপদ ১০০ টাকা মাত্র।

প্রকাশক: ড: কণিকা ত্রিবেদী, নির্দেশক,
কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।
সম্পাদক মণ্ডলী: এন বি কর, এস কে দত্ত, এ কে ভার্মা, এবং তাপস কুমার মৈত্র।
মুদ্রণ: ইউনিমেজ, কলকাতা

মূল্য ১০ টাকা মাত্র

বর্ষ: ১ সংখ্যা: ৪ ত্রৈমাসিক পত্রিকা অক্টোবর ২০১৬

মুর্শিদাবাদে রেশম চাষের ইতিকথা

(পর্ব-২)

রেশম চাষে মুর্শিদাবাদের ইতিকথা রেশম কৃষি বার্তার প্রথম বর্ষ – তৃতীয় সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে। তাতে প্রারম্ভিক ভাবে বহরমপুরের কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থানের ইতিহাস খোঁজার প্রচেষ্টা ছিল। এই সংখ্যায় প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বিষয়ক পরিপূর্ণ আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে:

ভারতের নানা প্রান্তে রেশম পাওয়া গেলেও সমস্ত প্রকার রেশম পাওয়া যায় একমাত্র এই বাঙলায় – মালবেরী, তসর, এরি এবং মুগা। অর্থাৎ রেশম বৈচিত্র্য ও রেশম বস্ত্রের বয়ন শৈলী বাঙলাকে এক অনন্য বৈশিষ্ট এনে দিয়েছে। শুধুমাত্র বয়নে নয়, রেশম ছিল বাঙালীর মননে, অর্থনীতিতে, বিভিন্ন সমাজিক লোকগাথায় এবং প্রবাদে। একটা সময় রেশম ছিল বাঙলার অর্থনীতির মূলস্রোত। এর অর্থনৈতিক ঐতিহ্য আর প্রতাপ দিল্লী তথা উত্তর ভারতকেও লজ্জা দিত। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রেশম চাষ হলেও, তার ইতিহাস এই বাঙলায় গ্রথিত রয়েছে। মাইসোর সিল্ক টিপু সুলতানের আমলে এই বাঙলা থেকেই গিয়েছিল। অর্থাৎ স্থান মাহাত্যে এই বাঙলাই রেশম শিল্পের আঁতুরঘর বিশেষ।

বাঙলার রেশম উৎপাদনের সিংহভাগ আসে মালদহ, মুর্শিদাবাদ আর বীরভূম থেকে যা রেশম উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। আর শশাঙ্কের সময়ে রাজধানী কর্ণসুবর্ণ হওয়ায় রেশম বিপননে মুর্শিদাবাদ অতিরিক্ত গুরুত্ব লাভ করে। মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের মালয়েশিয়ার শিলালিপি (আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ) অনুযায়ী কর্ণসুবর্ণ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। তৎসন্নিকটে রাজবাড়িডাঙ্গার রক্তমৃত্তিকায় ছিল বুদ্ধগুপ্তের বাসস্থান। রেশম ছিল বাণিজ্য বস্তুসকলের মধ্যে মহার্ঘ। সেই সময়ের প্রামাণিক তথ্যে বহির্বাণিজ্যে এই এলাকার উল্লেখ পাই (গ্রীক দেবীর নামাঙ্কিত সীলমোহর; রাজবাড়িডাঙ্গার উৎখনন)। এছাড়া পাই শশাঙ্কের আর্থিক সমৃদ্ধির খবর তাঁর প্রবর্তিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলনে।

পরবর্তী ১০০ বৎসরের শিল্প, বাণিজ্য সংস্কৃতিতে বাঙলার মাৎসন্যয় ঋণাত্মক অনুঘটকের কাজ করেছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অরাজকতার ফলে। যদিও পরবর্তী পাল বংশের রাজত্বকালে এক অসাধারণ ও প্রগতিশীল সিদ্ধান্ত নেয় বাঙলার জনগণ গোপালকে নির্বাচিত করে।

এ সময়ে শিল্প-বাণিজ্যে বাঙলার প্রভাব সুদুরপ্রসারী হয়ে ওঠে। এর পর আসে সেনবংশ আর তারপর নবাবী আমল। শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে বয়নশিল্পের অপূর্ব সম্ভার "বালুচরী"। তবে খ্যাতির চরম শিখর আসে বিদেশী বণিকদের হাত ধরেই। বাঙলার রেশম বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশের ক্রেতাদের পছন্দ-অপছন্দের কারণে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ রিচার্ড ওয়াইডারকে বাঙলায় পাঠায় রেশমের গুণগত মানের উন্নতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে যাতে তা ইউরোপের বাজারজাত করতে অসুবিধা না হয়। মূলতঃ তাঁরই উদ্যোগে বাঙলার রেশম বিদেশের বাজারে একছত্র অধিকার লাভ করে। তাঁকেই বাঙলা তথা ভারতের রেশম গবেষণার পথিকৃত বলা যায়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আনুকূল্যে মিঃ হার্টন ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের তত্ত্বাবধানে বাংলার রেশম হয়ে দাঁড়ায় ভারত থেকে বিলেতে আমদানীকৃত রেশমের সিংহভাগ। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শুধুমাত্র কাশিমবাজার ফ্যাক্টরী ০.৯ মিলিয়ন টাকা আয় করেছিল কাঁচা রেশম বিদেশে রপ্তানী করে। অর্থাৎ ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিলই – সাথে যোগ হয়েছিল ইউরোপীয় কলাকৌশল। এই পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বাংলার রেশম-বাণিজ্য সুসংহত রূপ নেয়।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে জানা যায় যে ১৬২১ খৃষ্টাব্দে সুরাট থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একদল পর্যবেক্ষক এসেছিল বাঙলার রেশমের খবর নিতে। তার আগে বাঙলার রেশম মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমেই রপ্তানী হোত। ১৬২১ থেকে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তারা বুঝেছিলেন যে শুধুমাত্র কেনা-বেচার জন্য নয়, লাভের জন্যই বাঙলায় থাকা এবং কুঠি নির্মাণ আবশ্যক। ১৬৫৮ সালে নির্মিত হল কাশিমবাজার কুঠি; ১৬৮১ তে বাঙলায় বিনিয়োগ দাঁড়ায় ২,৩০,০০০ পাউন্ডের মত যাঁর সিংহভাগ (১,৪০,০০০ পাউন্ড) ছিল কাশিমবাজারে। ১৭৭৩ সালে জঙ্গীপুরে ৬০০ চুল্লী এবং ৩০০০ কর্মী নিয়ে স্থাপিত হয় ফিলেচার। ১৯২৭ সালে রেশম বয়ন, রঙ করা ও ছাপাইয়ের কাজে বেঙ্গল সিল্ক টেকনোলজিকাল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয় অধুনা বহরমপুর কারাগার সংলগ্ন এলাকায়। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া আধিপত্য ও তৎপরবর্তীকালে ইংরাজ সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রেশম গবেষণা মূর্ত রূপ পায়।

১৯৩৭-৩৮ সালে মালবেরী চাষ, পলুচাষ ও রোগ নিয়ন্ত্রণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বসু বিজ্ঞান মন্দির যথেষ্ট সহায়তা করে। এইচ. এম. লেফ্রয় এবং সি. সি. ঘোষ (Report of an enquiry into the Silk Industry in India–Vol-I, II, III; 1916) রেশম শিল্পের অবনতি এবং তার থেকে উত্তরণের উপায়ের সন্ধান আলোকপাত করেন। এরই ফলে ১৯৩৪ ও ১৯৪০ সালের তথ্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয় Imperial Sericulture Committee, Indian Tariff Board ইত্যাদি। এই কমিটি Board of Industry-র পূরক হিসাবে কাজ করে এবং তৎকালীন ১ লক্ষ টাকা রেশম উৎপাদক রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করে।

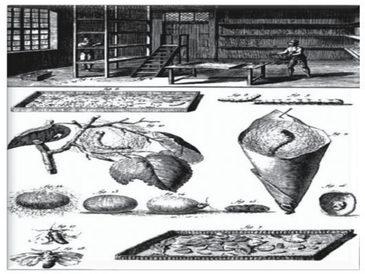

বাঙলাই ছিল রেশম শিল্পের উৎসস্থল এবং প্রাক-স্বাধীনতা সময়ে বৈজ্ঞানিকদের কর্মস্থল। বাঙলা সরকার ১৯৪০ সালে ব্যাঙ্গালোরে প্রথম All India Sericulture Conference এর ডাক দেয় এবং দ্বিতীয়টি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়; তৃতীয়টি অনিবার্য কারণে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এ সমস্ত Conference এর মূলসুর ছিল একটি সুসংহত Sericulture Research Station স্থাপনের, যা হবে কলকাতার কাছাকাছি। কারন, কলকাতাই ছিল তখন গবেষণার পীঠস্থান।

দমদমের নারায়ণপুর কলোনীতে জমি ও বাড়ি পাওয়া গেল একজনের দানে। স্থাপিত হল দেশের প্রথম "মালবেরী রিসার্চ স্টেশন"। কিন্তু তা এখন বিস্মৃতির অতলে। বেঙ্গল গভর্নমেন্টের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এবং দিকপাল বৈজ্ঞানিকদের [University College of Science এর প্রফেসর এইচ. কে. মুখার্জী (Zoology), প্রফেসর এস. পী. আগরকর (Botany), প্রফেসর জে. এন. মুখার্জী (Physical Chemistry), রায় বাহাদুর ড. গোপাল চন্দ্র চ্যাটার্জী (Bacteriology)] গবেষণায় রেশম শিল্পের বিভিন্ন দিক ও দিশা নির্দেশ পাওয়া যায়। বেঙ্গল গভর্নমেন্টের এই উদ্যোগকে গুরুত্ব দিয়েই **১৯৪৩ সালের ১৫ই অক্টোবর ভারত সরকার বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজের উত্তর প্রান্তের দ্বিতীয় তলে সেন্ট্রাল সেরিকালচার রিসার্চ স্টেশন স্থাপন করে।** প্রতিষ্ঠানের প্রথম অফিসার ইন-চার্জ হন মিঃ চারুচন্দ্র ঘোষ, যিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন সিল্ক ফিলেচার স্কীমের স্পেশাল অফিসার হিসাবে। ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রকের III-Ind(8) / 43 dated Nil পত্রানুসারে তাঁকে অতিরিক্ত ২০০ টাকা মাহিনায় নিযুক্ত করা হয়। সঙ্গে দেওয়া হয় বেঙ্গল সিল্ক টেকনোলজিকাল ইনস্টিটিউট এর স্টাফ, ল্যাবরেটরী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি; সাথে দেওয়া হয় বহরমপুর নার্সারীর (স্থাঃ ১৯০৯) জমি ও পলুপালন ঘর। শুরু হয় এক ঐতিহাসিক যাত্রা। শুরুতে মাত্র চার বৎসরের জন্য অনুমোদিত হলেও এ যাত্রা আজও অমলিন।

একদম প্রারম্ভে গবেষণার ব্যাপারটি মোটামুটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল। ১৭৫৭ সালে মিঃ রিচার্ড ওয়াইডার ও মিঃ হার্টন, ১৮৭০ এর দশকে লুই পাস্তুর ইত্যাদি স্বনামধন্য বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা এবং স্বদেশী বৈজ্ঞানিক মিঃ এন. জি. মুখার্জী, মিঃ চারুচন্দ্র ঘোষ ইত্যাদিদের মাধ্যমে রেশম গবেষণা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও ক্রমশঃ সুসংহত রুপ নিতে শুরু করে। দমদমের গবেষণাগার বা বিজ্ঞান কলেজের গবেষণাগারে প্রারম্ভিক কাজ শুরু হলেও ১৯৪৩ এ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয় এক আধুনিক রেশম গবেষণা কেন্দ্রের।

এই গবেষণা কেন্দ্র আত্তীকরণ করেছে পূর্বসুরীদের জ্ঞান, গবেষণালব্ধ তথ্য, দমদম নারায়ণপুরের "মালবেরী রিসার্চ স্টেশন", সেরি-রিসার্চ ল্যাবরেটরী (৯২, আপার চিৎপুর রোড) সেরি-এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশন (নারায়ণপুর কলোনী, দমদম, ২৪-পরগণা), বেঙ্গল সিল্ক টেকনোলজিকাল ইনস্টিটিউট এর স্টাফ, ল্যাবরেটরী, যন্ত্রপাতি, বহরমপুর নার্সারীর জমি ও পলুপালন ঘর। অর্থাৎ ১৯৪৩ এ স্থাপিত এই সংস্থানে মিশেছে অন্য অনেক সংস্থার অবদান। আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তাদের অবদানের কথা স্মরণ করি।

১৯৬৩ সালের ২২শে নভেম্বর বহরমপুর রেল স্টেশনের পূর্ব প্রান্তে এই সংস্থান নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৫ সালে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমানে প্রয়াত প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয়ের করকমলে রিসার্চ ও অ্যাডমিনিষ্ট্রেসন ভবনের উদ্বোধন হয়।

৫০ থেকে ৭০ এর দশক ছিল গবেষণার স্বর্ণযুগ। এই সময়েই আবিস্কৃত হয় সাড়া জাগানো তুঁত প্রজাতি এস-১ ও আরও বহু-স্থানিক প্রজাতি; পলুর বিভিন্ন সংকর প্রজাতি এবং কৃষির বিভিন্ন পদ্ধতিগত দিক। আর শুরু হয় কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ডের সাথে সম্পর্ক তৈরীর প্রক্রিয়া। কালের প্রয়োজনে CSRS নাম বদলে CSR&TI হয়।

৭০-৯০ দশক ছিল গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও বিভিন্ন প্রযুক্তিকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ। তৈরী হয় বিভিন্ন উপকেন্দ্র, গ্রেনেজ ইত্যাদি এবং হাতে নেওয়া হয় গবেষণা বিস্তারের নানা কর্মসূচী। ৯০ এর দশকে জাতীয় রেশম প্রকল্প বা National Sericulture Project রেশম শিল্পে সারা দেশে নিয়ে আসে এক অভূতপূর্ব নবজাগরণ। রেশম গবেষণার সাথে সাথে বিস্তার কর্মসূচী এই সময়েই প্রাধান্য লাভ করে।

৯০ এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত এই রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা এক মহীরূহে পরিণত হয়ে তার কাজে বিভিন্ন সাফল্য ও স্বীকৃতির পালক সংযোজন করেছে। গরীব কৃষকের আরও আর্থিক উন্নতি সাধনে সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টা জারী থাকবে এই কামনা করি।

তথ্যসূত্র:

- বেঙ্গল গেজেটিয়ার, মুর্শিদাবাদ
- এ ডিসকভারি অব ইকনমিক প্রোডাক্টস প্রোডাক্টস্- জি. ওয়াট
- সিল্ক ইন্ডাস্ট্রি – সী. সী, ঘোষ
- Seri Exptl. Station, Narayanpur Colony, Dum Dum, 24 Parganas
- Seri Res. Laboratory, 92, Upper Chitpur Road, Calcutta
- https://www.google.co.in/search?q=sericulture+history+in+bengal+photographs

ইন্দ্রজিত রায়, প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক

মাটি পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি ও তুঁতচাষে সালফার সারের ব্যবহার

মাটি পরীক্ষা:

মাটি পরীক্ষার জন্য তুঁতগাছের মুড়া কাটার পর কোনরকম সার বা সেচ প্রয়োগের আগে মাটির নমুনা সংগ্রহ করুন। তবে বর্ষাকালে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা উচিৎ নয়।

- পুরো তুঁত জমিকে আঁকবাঁকা রাস্তার মত কল্পনা করে প্রতি একরে কমপক্ষে ২০টি জায়গা থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

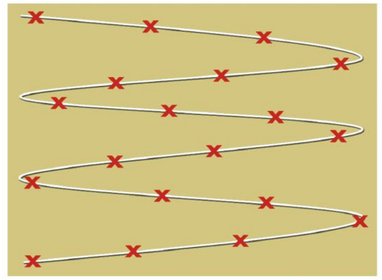

X = প্রতি একরে ন্যূনতম ২০টি

- কোদাল বা খুরপি দিয়ে প্রতিটি জায়গার মাটির উপরিভাগের আগাছা পরিস্কার করতে হবে।
- কোদাল দিয়ে এক ফুট গভীরতার "V" আকৃতির গর্ত খুঁড়তে হবে। ঐ গর্তের উপর থেকে তলদেশ পর্যন্ত শুকনো কাঠির দ্বারা ঘষে মাটি সংগ্রহ করতে হবে।

- সমস্ত জায়গা থেকে সংগৃহীত মাটিকে ভালভাবে মেশাতে হবে এবং মেশানোর সময় অবাঞ্ছিত পদার্থগুলিকে যেমন, গাছের শিকড়, পাথর, নুড়ি ইত্যাদি বাদ দিতে হবে।

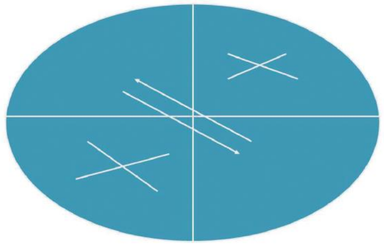

- ঐ মিশ্রিত মাটিকে ডিম্বাকার আকৃতিতে বিস্তৃত করে আঙ্গুলের সাহায্যে চার ভাগে ভাগ করতে হবে। দুটি বিপরীত ভাগের মাটি ফেলে দিতে হবে এবং বাকি দুটি ভাগকে পুনরায় মেশাতে হবে।
- এই পদ্ধতি বারংবার করতে হবে এবং সব শেষে প্রায় ৫০০ গ্রাম মাটি পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে।

সালফার সারের ব্যবহার:

তুঁতগাছের বৃদ্ধি ও বিকাশে মহত্বপূর্ণ অবদানের ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের পর চতুর্থ বৃহৎ প্রয়োজনীয় উপাদান স্বরুপ সালফার বর্তমানে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুষম সার হিসাবে এর প্রয়োগ তুঁতচাষে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পূর্ব ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমির সেচ-সেবিত অঞ্চলে তুঁতপাতা উৎপাদনের জন্য পূর্ববর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত সালফার প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়ে থাকে:

সালফার	
মাটিতে পরীক্ষিত মান (কেজি/ হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর/ বছর)
৫	৯৪
১০	৭৬
১৫	৫৯
২০	৪২
২৫	২৫
৩০	৮
৩৫	০

প্রতি ফসলে গাছের মুড়াকাটার পর তুঁতগাছে নুতন পাতা গজানোর সময় মাটিতে অ্যামোনিয়াম সালফেট রুপে সালফার সমান বিভাজিত মাত্রায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের সঙ্গে প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়ে থাকে।

রঞ্জিত কর, আর.এস.আর.এস., কালিম্পঙ

কিষাণ নার্সারী – এক লাভজনক উদ্যোগ

তুঁতগাছ একটি বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। কাটিং ভিত্তিক তুঁতবাগান তৈরী অপেক্ষা কলম বা চারা ভিত্তিক তুঁতবাগান তৈরী করে অনেক বেশী লাভ পাওয়া যায়। অর্থাৎ কলম পদ্ধতিতে বাগান তৈরী করলে তুঁতগাছের বেঁচে থাকার হার, প্রাণশক্তি, পুষ্টিগত মান এবং বৃদ্ধির হার অনেক বেশী লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব এবং উত্তর-পুর্ব ভারতে তুঁতচাষের বিস্তারের সাথে সাথে **"কিষাণ নার্সারী"**-র ধারণা বহুল জনপ্রিয় এবং লাভজনক উদ্যোগ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে নার্সারীর জন্য তুঁত কাটিং সাধারণত: বর্ষা-পরবর্তী সময়কে (সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর) বেছে নেওয়া হয়। কিষাণ নার্সারী স্থাপন করার জন্য নিম্নবর্ণিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা প্রয়োজন:

অনুমোদিত গাছের প্রকার: এস-১৬৩৫

জমির তৈরীর প্রস্তুতি: জলের কোন উৎসের কাছাকাছি দোআঁশ মাটির উঁচু সমতল জায়গা কিষাণ নার্সারীর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। যেখানে প্রচুর পরিমাণ জলের ব্যবস্থা আছে এমন জায়গায় ভূতল থেকে ৫-১০ সেন্টিমিটার